IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

রবীন্দ্রনাথের গানে স্বরলিপির ভূমিকা - একটি গবেষণাভিত্তিক আলোচনা

Dr. Jhinuk Talapatra

Abstract:

রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলা সংগীতজগতের এক অনন্য সৃষ্টি, যার সুর, বাণী ও ভাবের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র সংগীতধারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানের সঠিক সুররূপ সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা অবিকৃতভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপির ভূমিকা, ভারতীয় স্বরলিপি পদ্ধতির বিবর্তন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষায় স্বরলিপির গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিভা দেবী প্রমুখের উদ্যোগে বাংলা স্বরলিপি পদ্ধতির ক্রমবিকাশ ঘটে এবং আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি রবীন্দ্রসঙ্গীত সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়ে ওঠে।

প্রবন্ধে আরও আলোচিত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিভিন্ন স্বরলিপিকারের মাধ্যমে তাঁর অধিকাংশ গান স্বরলিপিবদ্ধ হলেও পরবর্তী সময়ে গায়কীভেদে সুরবিকৃতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বভারতী কর্তৃক গঠিত ‘স্বরলিপি সমিতি’ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য সুররূপ নির্ধারণ, স্বরলিপি সম্পাদনা এবং ‘স্বরবিতান’ প্রকাশের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। গবেষণাটি দেখায় যে, স্বরলিপি কেবল সুরসংরক্ষণের একটি লিখিত মাধ্যম নয়; বরং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কাঠামো, স্বকীয়তা এবং নান্দনিক বৈশিষ্ট্য রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। একই সঙ্গে প্রবন্ধে গুরুমুখী শিক্ষার গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে, কারণ স্বরলিপি সুরের কাঠামো প্রদান করলেও গানের রস, ভাব ও সূক্ষ্ম অলংকার আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ সংগীতশিক্ষা ও অভিজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্য।

অতএব বলা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধ রূপ সংরক্ষণ, প্রচার এবং উত্তরাধিকার রক্ষায় স্বরলিপি এবং বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতির অবদান অনস্বীকার্য। এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাঠ, পরিবেশন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে স্বরলিপির তাৎপর্যকে নতুনভাবে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়।

Keywords:

রবীন্দ্রসঙ্গীত, স্বরলিপি, আকারমাত্রিক স্বরলিপি, বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতি, স্বরবিতান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীত সংরক্ষণ, সংগীত শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা সংগীত।

রবীন্দ্রসংগীত গাইবার ক্ষেত্রে স্বরলিপির ভূমিকা ঠিক কতোটা – সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধটিতে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। স্বরলিপির বিবর্তন এবং বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতি – সম্বন্ধেও এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান রচনার গোড়ার দিকে গান রচনা করেছেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই গান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের অথবা ব্রহ্মসমাজের সদস্যদের শিখিয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের অথবা ব্রহ্মসমাজের সদস্যদের শিখিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে তাঁর গান ধীরে-ধীরে ঠাকুরবাড়ি এবং ব্রাহ্মসমাজের অলিন্দ পেরিয়ে জগৎ সভায় ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রম গড়ে তোলার পরও তিনি আশ্রমবালকদের সানন্দে, যত্ন করে গান শিখিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে তাঁর গান ধীরে-ধীরে ঠাকুরবাড়ি এবং ব্রাহ্মসমাজের অলিন্দ পেরিয়ে জগৎ সভায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক – প্রচারিত হোক, প্রসারিত হোক – এই ছিল তাঁর একমাত্র এবং একান্ত অভিলাষ।

"রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম যুগে এত স্বরলিপির শাসন ছিলোনা। উনি গান রচনা করেই সে সব স্নেহের পাত্রীদের শেখাতেন, তাঁরাই ছিলেন তাঁর গানের জীবন্ত স্বরলিপি।"[1]

গান রচনা করবার এবং সেই গান সস্নেহে বিলিয়ে দেবার অনাবিল আনন্দই তাঁকে সারাক্ষণ ঘিরে রাখত। তাহলে হঠাৎ করে তিনি তাঁর গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করবার তাগিদ অনুভব করলেন কেন ? এই প্রশ্নের একটা উত্তর অবশ্যই এই যে, দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর গানকে স্বরলিপিবদ্ধ না করলে কালপ্রবাহে এই গান হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, একথা সর্বজনবিদিত যে, তিনি গানে সুরযোজনা করেই সেই সুর ভুলে যেতেন। তাই গান রচনার অব্যবহিত পরই সেই গানকে স্বরলিপিবদ্ধ না করলে গানগুলি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, একথা কবি উপলব্ধি করেছিলেন।

তিনি একদিকে যেমন চাইতেন তাঁর গান সবাই গাক, সকলের কণ্ঠে মুখরিত হোক; ঠিক তেমনই তিনি এও প্রবলভাবে চাইতেন যে, তাঁর গান যেন 'তাঁর' বলে মনে হয়, যেন মনে না হয় গানের কথাটা ওঁনার আর সুরটা অন্য কারো দেওয়া। জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় তিনি নিজের গানের অপভ্রংশ শুনেছেন এবং যারপরনাই ব্যথিত হয়েছেন, চিন্তিত হয়েছেন নিজের গানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। নিজের কাছের মানুষদের তিনি বারংবার আকুলভাবে অনুরোধ করেছেন যাতে তাঁর গানের স্বকীয়তা এবং মূল চরিত্রটি বজায় থাকে। এই আকুলতা যতো প্রবল হয়েছে, তিনিও ততোটাই তাঁর গানকে স্বরলিপিবদ্ধ করার এবং সেই স্বরলিপি মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, একমাত্র স্বরলিপিই পারে তাঁর গানকে এর সকল শুদ্ধতাসহ কালের প্রবাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে, রক্ষা করতে। রবীন্দ্রসংগীত মূলত: প্রবন্ধ সংগীত, বিটোফেন বা মোৎজার্ট-এর রচনাগুলির মতন অটুট ও একক, এই সংগীতকে স্বরলিপিবদ্ধ করলেই একমাত্র এর কৌলীন্য অদূর ভবিষ্যতে বজায় রাখা সম্ভব হ'বে, নইলে সময়ের স্রোতে ভেসে এই গান বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল – এ কথা রবীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

স্বরলিপির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, গানের সুরকে বেঁধে রাখবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ইউরোপীয় রৈখিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলায় আরো একটি স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন, সেটি হ'ল রেখামাত্রিক স্বরলিপি। তবে, এই স্বরলিপি পদ্ধতিটি কার্যকর হয় নি বললেই চলে। ১৮৬৮ সালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী দন্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তবে, এই

[1] 'সুরের আগুন'- সন্ধ্যা সেন, পৃ.- ১৭

পদ্ধতিটি প্রথম ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর অগ্রজ-কৃত স্বরলিপি পদ্ধতিটি কীভাবে আরো সরলীকৃত করা যায়, সেই চেষ্টায় রত ছিলেন। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার (১৮৮৫) 'বালক' পত্রিকায় এবং 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি 'গানের স্বরলিপি' নাম্নী একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এই প্রবন্ধে তিনি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তবে, উক্ত স্বরলিপি পদ্ধতিটির প্রচারে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সর্বাধিক ছিল। এর প্রায় বছর তিনেক পর পরিবর্তন, পরিমার্জন, নানান বিবর্তন এবং নিরন্তর গবেষণার ফলস্বরূপ অবশেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়। 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১) অঘ্রাণ ও পৌষ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর এই নতুন স্বরলিপি পদ্ধতিটি প্রথম প্রকাশ করেন। এই স্বরলিপি পদ্ধতিটি যাতে সহজে অনুসরণ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবী আকারমাত্রিক স্বরলিপির নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির বহুল প্রচারের জন্য তথা এই পদ্ধতিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রণীত 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থ, 'বীণাবাদিনী', 'সংগীত প্রকাশিকা' এবং 'ভারতী' পত্রিকার গুরত্ব অপরিসীম। 'স্বরলিপি গীতিমালা' গ্রন্থটি ডোয়ার্কিন এন্ড সন্ কোম্পানি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ১১৬টি গানকে আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি অনুসারে স্বরলিপিবদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের লয়-নির্বাচনের প্রণালীটিও উদ্ভাবন করেছিলেন।

১৯২৩ সালের পূর্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকায় (তত্ত্ববোধিনী, বালক, ভারতী, আনন্দসংগীত – প্রভৃতি) অথবা গ্রন্থেই বেশিরভাগ রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হ'ত। বিশ্বভারতী থেকে প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তাঁর নির্দেশে এবং অনুমোদনে তাঁর অধিকাংশ গানই স্বরলিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে স্বরলিপি লিখনে অনভ্যস্ত হওয়ায় এবং এই গানের স্বরলিপিকারদের সংখ্যাধিক্যের ফলে স্বরলিপিকারদের নিজস্ব অনুভূতি, 'আপন মনের মাধুরী'-র প্রতিফলন স্বরলিপিতে প্রতিফলিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। ফলত:, রবীন্দ্রোত্তরকালে অর্থাৎ ১৯৪১ সালের পর রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার এবং প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের গানের বিকৃতি ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে, প্রামাণ্য মুদ্রিত স্বরলিপির অভাব এই বিকৃতিকে আরো প্রকট করে তোলে। এমতাবস্থায় রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেয়।

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ এবং তার সম্পাদনা কোন্-কোন্ নীতি দ্বারা অনুসৃত হবে – সেই বিষয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এবং তৎকালীন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন, সেই প্রস্তাবগুলি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত' – নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রসংগীতের একাধিক সুর, স্বরলিপি এবং সুর সম্বন্ধে মতান্তরের সমস্যার প্রতিবিধান। এই প্রবন্ধের মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ –

১৯১৫ সালের পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রে কলকাতায় প্রকাশিত স্বরলিপিগুলিই প্রামাণ্য, এক্ষেত্রে, গান যতো পূর্ববর্তী – ততোই বেশি প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হবে। যে সকল রবীন্দ্রনাথের গানগুলি ১৯১৫ সালের পরবর্তীকালে প্রকাশিত, সেই সকল গানের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী প্রকাশিত এবং প্রধানত: দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলিকেই প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করা হবে। পূর্বে প্রকাশিত স্বরলিপি এবং তখনকার গায়কীর মধ্যে বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা গেলে শান্তিনিকেতনে প্রচলিত সুরটিকেই প্রাধান্য দেওয়া সমীচিন ব'লে মনে করেছেন ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রনাথের কাছে যাঁরা গান শিখেছিলেন, তাঁদের স্মৃতি এবং স্মৃতিলিপিকেই সেই মুহূর্তে সবচাইতে বেশি প্রামাণ্য বলে ধরা হয়। কবির প্রথম

জীবনের স্বরলিপিকারদের মধ্যে মূলত: জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জীবনের মধ্যভাগের ব্রহ্মসংগীতের স্বরলিপিকারদের মধ্যে কাঙ্গালীচরণ সেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এইসময়ের রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানগুলিকে যাঁরা স্বরলিপিতে বেঁধেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী এবং কবির জীবন সায়াহ্নে রচিত রবীন্দ্রসংগীতগুলির স্বরলিপিকারদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ, অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদার-কৃত স্বরলিপিগুলিকেই প্রামাণ্য স্বরলিপি বলে মনে করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।[2]

রবীন্দ্রনাথের গানের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তৎকালীন বিশ্বভারতীর প্রনেত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে 'স্বরলিপি সমিতি' গঠিত হয়। আনুমানিক সেই বছরেরই এপ্রিল মাসে শান্তিনিকেতনে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক হিসেবে অনাদিকুমার দস্তিদার নিযুক্ত হ'ন। সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। এই সমিতির সদস্য ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদার। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বভারতী থেকে স্বরলিপিগ্রন্থ সংকলন এবং প্রকাশনা। উক্ত সমিতিতে কোন্ স্বরলিপি গ্রন্থাদি সম্পাদিত হবে, সেই সম্পাদিত গ্রন্থাদি কবে প্রকাশিত হবে, সম্পাদন ও প্রকাশনের আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয়াদির আলোচনা এবং সেই সকল আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সম্বলিত ৬৫ খন্ডের 'স্বরবিতান' গ্রন্থ এই স্বরলিপি সমিতি থেকেই প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে একটি নতুন স্বরলিপি সমিতি গঠন করেন। বিশ্বভারতী কর্মসমিতির অনুমোদনে এই নবগঠিত স্বরলিপি সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন – কালিদাস ভট্টাচার্য (সভাপতি), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, সুশীল রায়, সুচিত্রা মিত্র এবং প্রফুল্লকুমার দাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই সমিতি গঠিত হ'বার ৬ বছর পর ১৯৭৩ সালে আবারও আরেকটি স্বরলিপি সমিতি গঠন করা হয়।

রবীন্দ্রতিরোধানের পর রবীন্দ্রসংগীতের শূচিতা রক্ষার্থে স্বরলিপি সমিতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জীবনের উপান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ ক্ষেদোক্তি করেন –

" ... স্বরলিপিটা যদি সবাই ঠিক ভাবে মেনে চলত, তাহলেও ভাবনা ছিল না আমার। "[3]

নিজের প্রিয়তম সৃষ্টির প্রতিনিয়ত এমন 'বিকার' শুনে-শুনে কবি অত্যন্ত চিন্তিত এবং ভীত ছিলেন এই ভেবে যে, তাঁর গানকে 'স্বকীয় রসে' প্রতিষ্ঠিত রাখা বুঝি আর সম্ভব হবে না। দূরদর্শী কবি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গানের ভবিষ্যত কি হতে চলেছে। রবীন্দ্রসংগীতকে তার নিজস্বতাসহ টিকিয়ে রাখতে স্বরলিপির এবং বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতির অবদান অপরিসীম।

"...সৃষ্টিকর্তার কাঁধের উপর চড়ে ব্যায়ামকর্তার বাহাদুরি প্রচার" – করা রুখতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সচেতন ছিলেন।[4] শান্তিনিকেতন আশ্রমে যাঁরাই রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি আশ্রমের শিক্ষকদের বলতেন, পড়ুয়াদের এমনভাবে স্বরলিপি শেখাতে, যাতে তারা প্রত্যেকে চিঠি পড়বার মতন করে অনায়াসে, অবলীলায় স্বরলিপি পড়তে পারে। দিনেন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের গান শেখাবার পাশাপাশি স্বরলিপি নির্মাণের পদ্ধতিটিও শিখিয়ে দিতেন, যাতে তাদের ভবিষ্যতে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে বা শেখাতে কোনো

[2] 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত ' - ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী পত্রিকা,১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা, পৃ.- ২২

[3] 'রবীন্দ্রসংগীত: রবীন্দ্রনাথ: শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ'- কিরণশশী দে, পৃ.- ৯৯

[4] 'রবীন্দ্রসংগীত' - অনাদিকুমার দস্তিদার, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮০ সংখ্যা, পৃ.- ৬৮

অসুবিধা না হয়। শান্তিদেব ঘোষের সংগীতশিক্ষণ পদ্ধতিটিও ছিল স্বরলিপি অনুসারী। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, তিনি বরাবরই স্বরলিপি সামনে রেখে গান শেখাতেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদারও ছেলে-মেয়েদের গান শেখাবার সময় স্বরলিপির সঙ্গেও তাদের সম্যক পরিচয় করিয়ে দিতেন। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকালীন মূলত: শৈলজারঞ্জন মজুমদারের আগ্রহেই ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ সুর আহরণে, তার প্রচারে এবং স্বরলিপিকরণে সচেষ্ট হ'ন। তিনি তাঁর সংগীত ভবনের গানের ক্লাসে স্বরলিপি চর্চা করতেন, ছেলে-মেয়েদের স্বরলিপি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিতেন। সংগীত ভবনের পরবর্তী যুগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও বরাবর তাঁদের গুরুদের শেখানো পথটিকেই অনুসরণ করে এসেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীরা যেন এই গানের মূল সুরটি থেকে, এর অন্তরের রসটি থেকে কখনো বিচ্যুত না হয় – এই ছিল দীক্ষাগুরুদের প্রাথমিক অভিপ্রায়।

স্বরলিপি হল সুরের কাঠামো। এই কাঠামোয় প্রাণের পরশ ছোঁয়াতে না পারলে সেটি কেবলমাত্র শুষ্ক কাঠে পরিণত হয়। স্বরলিপি শিক্ষার জন্য চাই নিষ্ঠা আর একাগ্র সাধনা। স্বরলিপির সকল নিয়মগুলি বোঝবার জন্য, নিয়মগুলিকে সঠিকভাবে শেখবার জন্য এবং সেগুলিকে অনুসরণ করবার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বরশিক্ষার। আর যথাযথ স্বরশিক্ষার জন্য প্রয়োজন যথাযথ গুরুর সান্নিধ্য। স্বরলিপি পাঠের প্রাথমিক ধাপ হল প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্যে স্বরশিক্ষা। স্বরলিপিতে গানের বাণী, ছন্দ এবং সুরের নির্দেশনা দেওয়া থাকে, কখনো-কখনো শ্রুতিনির্দেশ দেওয়া থাকলেও কেবলমাত্র যথার্থ স্বরজ্ঞ গাইয়ের কণ্ঠবাদনেই সেই শ্রুতির অনুপম প্রকাশ ঘটে। দীক্ষিত কানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কোনো অণুকোমল বা অতিকোমলের অভিঘাত। এই তিন উপাদান এবং স্বরলিপির সকল সাংকেতিক চিহ্ন অধ্যয়ণ করবার জন্য প্রয়োজন যথার্থ শিক্ষার। আবার, প্রকৃত গুরুর নিকটে এই সকল শিক্ষা আয়ত্ত করে নিলেই যে ভালো রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারা যাবে – এমনটিও নয়। স্বরলিপি পাঠ শিক্ষা করে যান্ত্রিকভাবে নির্ভুল স্বরপাঠ করে গেলেই সেটি গান হয়ে ওঠেনা –

"স্বরশুদ্ধি এক জিনিস, সুরসিদ্ধি বা রসবুদ্ধি আর।"[5]

এর জন্য প্রয়োজন রসানুভূতি, ভাবানুভূতি, সুরের সম্যক জ্ঞান, পরিমিতি বোধ, নান্দনিক রুচি এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত প্রতিভার। একজন প্রকৃত গুরুই পারেন শিক্ষার্থীকে সঠিক পথ দেখাতে, ঠিক সুরটি চিনিয়ে দিতে। তবে, একথাও ঠিক যে, অন্তরের ভাব, নিজস্ব বোধ, রুচি – মানুষের ভিতরকার জিনিস, এগুলি কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না। আর ঠিক এই কারণেই একই স্বরলিপি অনুসরণ করে, একই গুরুর কাছে শিখে গাওয়া দু'জন শিল্পীর গান কখনোই একরকম হয় না। স্বরলিপি হল গানের শরীর, সেই শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার সম্পূর্ন দায়িত্ব শিল্পীর ওপর বর্তায়। যেই শিল্পীর গভীরতা যত বেশি, তিনি ততোই গানের গহিনে পৌঁছতে পারেন। রবীন্দ্রসংগীতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'খোঁজ-খাঁজ' স্বরলিপি থেকে শেখা যায় না। প্রকৃত শিল্পীই পারেন স্বরলিপি অবলম্বন করে সেই গীতসুষমাকে ফুটিয়ে তুলতে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর সুহৃদ শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী, কবির সামনে গান গাইবার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে লেখেন, স্বয়ং স্রষ্টার সামনে তাঁর গান গাইবার পর গুরুদেব বলেছিলেন –

"না:, এত প্লেন সুর এদের গলায় বেমানান, সুরের মধ্যে আর একটু খোঁজখাঁজ জুড়তে হবে।"[6]

এরপর তিনি নিজে সযত্নে গানের সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মীড়, সূক্ষ্ম শ্রুতি, হাল্কা গিটকিরিগুলি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

[5] 'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত ' - ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী পত্রিকা,১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, কার্তিক সংখ্যা, পৃ.- ২৪৩-৪৪

[6] 'সুরের আগুন'- সন্ধ্যা সেন,পৃ.-৪০-৪১

রবীন্দ্রসংগীতের এই সূক্ষ্ম মীড়, শ্রুতি, গিটকিরি, গমক, আশ – এই সকল সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বরলিপিতে নির্দেশিত থাকে না, এগুলি আয়ত্ত করতে হলে প্রকৃত গুরুর সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। সেই গুরু রবীন্দ্রসংগীতের পীঠস্থান শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াটাও সমানভাবে জরুরি। কারণ, উৎসস্থলের নিকটবর্তী জল সর্বদা নির্মল হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নীড়ে শিক্ষা'র মূল্যই আলাদা।[7] রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গেলে এই গানের বাণীকে আত্মস্থ করতেই হবে। কারণ, কথা এবং সুরের যুগলসম্মিলনই রবীন্দ্রসংগীত। স্বরলিপি হল বেঁধে দেওয়া সুরের কাঠামো – যাকে ঠিকমতন অনুসরণ না করলে মূল সুরটি তার আদল হারাবে। নিষ্প্রাণ স্বরলিপিতে প্রাণের স্পন্দন জাগাতে পারলেই তা মূর্ত হয়ে উঠবে, তা 'গান' হয়ে উঠবে। আবার অপরদিকে, যাঁদের রবীন্দ্রসংগীতে তেমন কোনো তালিম নেই, তাঁরা যদি স্বরলিপি পাঠ করতে জানেন, তাহলে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের সুরটি মোটামোটিভাবে শিখে নিতে পারবেন। একথা নি:সন্দেহে বলা যেতেই পারে যে, স্বরলিপির মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা অনেকটাই সম্ভব হয়েছে।

গান গুরুমুখী বিদ্যা, কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে তুলে নিতে হয়। তাই এই বিদ্যায় গুরুর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বেশি। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের অন্যথা ঘটে না। সুতরাং, গুরু ব্যতীত রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরলিপির ভূমিকাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলেন| তাঁর পারিবারিক বৃত্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী – এরাতো ছিলেনই, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের এই সকল সদস্যগণ ছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঙ্গালীচরণ সেন, অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদারদের ছায়ার মতন পাশে পেয়েছিলেন। এই স্বরলিপিকারেরা এবং বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতি না থাকলে রবীন্দ্রনাথের গানকে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসহ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হ'ত না। রবীন্দ্রনাথের গানের মূল কাঠামোটি ধ্বস্ত হয়ে যায় নি, কারণ তাকে প্রাণপনে আগলে রাখতে এঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী, স্বরবিতান পুস্তকমালার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল গানের সুর ধরে রাখবার যেই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল, তারই ফলস্বরূপ আজও রবীন্দ্রসংগীত স্বমহিমায় বিদ্যমান।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার থেকে ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে কৃত একটিমাত্র গানের স্বরলিপির পান্ডুলিপিটি নিচে দিয়ে দেওয়া হল –

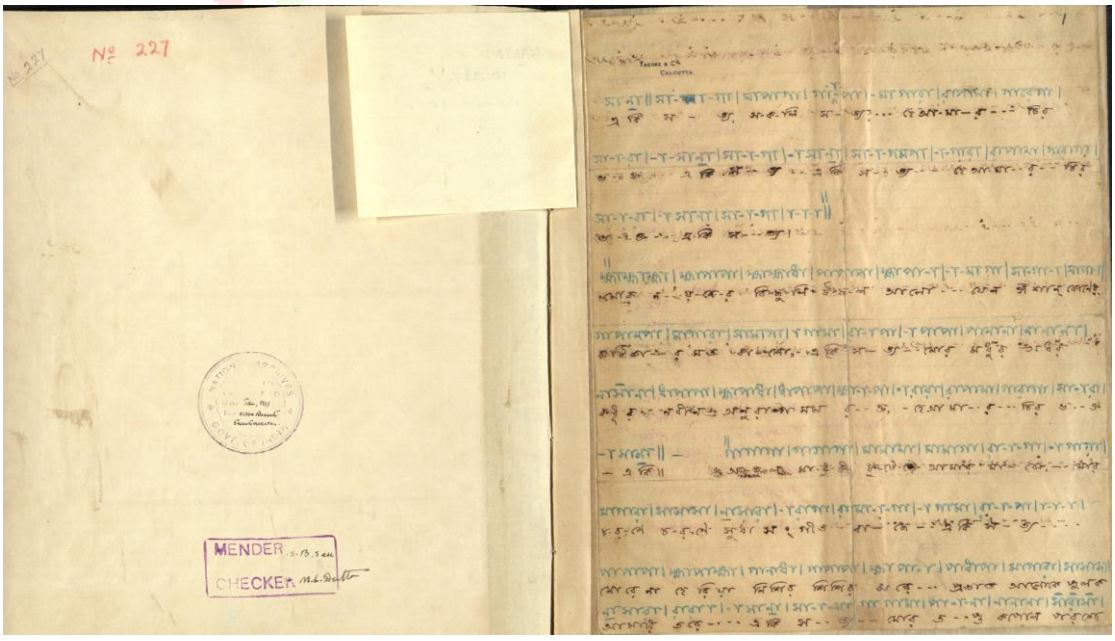

[7] 'দেশ' পত্রিকা,সাহিত্য সংখ্যা,১৩৮০, সুবিনয় রায়ের নেওয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষাৎকার, পৃ. - ৭৩

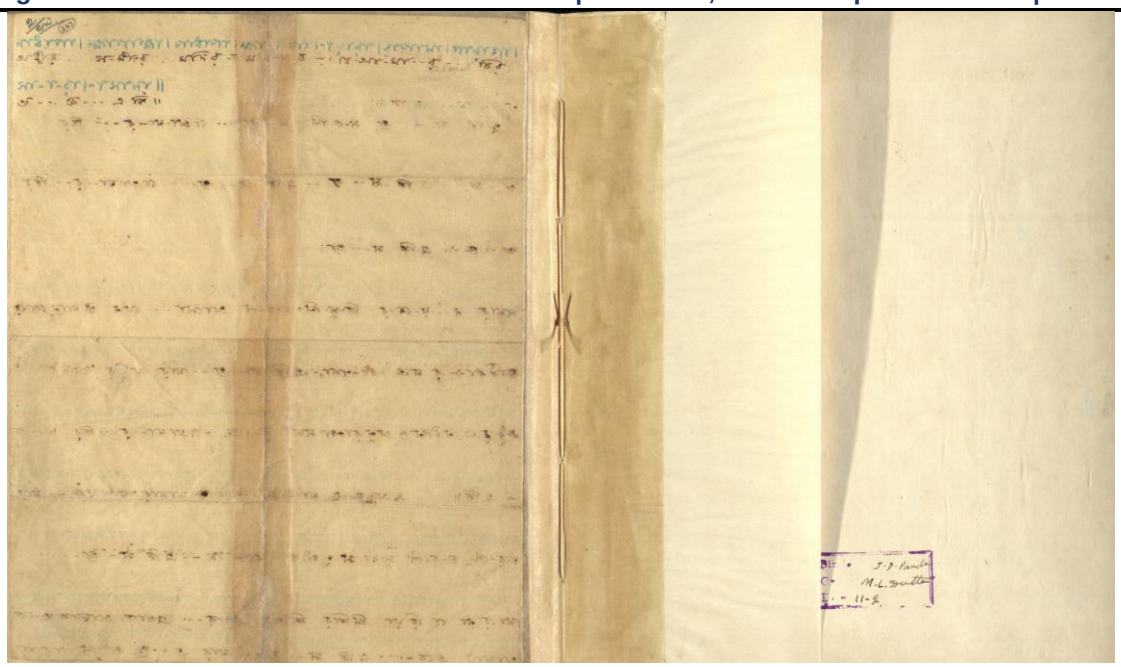

গ্রন্থপঞ্জী

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (ভাদ্র, ১৩৪৭)। *ছেলেবেলা,* প্রকাশক - শ্রী কিশোরীমোহন সাঁতরা, বিশ্বভারতী, ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩১৯)। *জীবনস্মৃতি ,* প্রকাশক - শ্রী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্, ৫৫, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (বৈশাখ ১৩৭৩: ১৮৮৮ শক)। *সংগীত-চিন্তা ,* প্রকাশক - শ্রী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা - ৭
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (আশ্বিন, ১৩৮৯)। *রবীন্দ্র-পরিচয় ,* প্রকাশক - শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দেবী, সাহানা। (নভেম্বর, ১৯৭৮)। *স্মৃতির খেয়া ,* প্রকাশক - উপমা সেনগুপ্ত, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭
- দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। (আশ্বিন, ১৩৮৭)। *শান্তিনিকেতনের এক যুগ,* প্রকাশক - রণজিৎ রায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- দাস, প্রফুল্লকুমার। (২৫শে বৈশাখ,১৩৭৯)। *রবীন্দ্রসংগীত - গবেষণা - গ্রন্থমালা ১ম খন্ড ,* প্রকাশক - শ্রী প্রভাস নিয়োগী, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০২৬
- ঐ। (৯ই আশ্বিন, ১৩৮০)। *তদেব ২য় খন্ড,* প্রকাশক - শ্রী প্রভাস নিয়োগী, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা - ৭০০০২৬
- সেন, অমিতা। (১৩ই চৈত্র, ১৩৮৯)। *আনন্দ সর্বকাজে ,* প্রকাশক - শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রবীন্দ্রচর্চাভবন, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৬
- সেন, সন্ধ্যা। (কার্তিক,১৩৮৬)। *সুরের আগুন , ১ম খন্ড,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা -৭০০০০৯

- সেন, সন্ধ্যা। (ফাল্গুন, ১৩৮৮)। *সুরের আগুন , ২য় খন্ড,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা -৭০০০০৯
- নাগ, কালিদাস। (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪)। *সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ,* প্রকাশক - শ্রী সুধাংশু বক্সী, সুমুদ্রণ, ১০ নং ঠাকুরদাস পালিত লেন, কলকাতা
- হালদার, অসিত কুমার। (১লা মাঘ, ১৩৬৫)। *রবিতীর্থে* , প্রকাশক - শ্রী মাধব চক্রবর্তী, অঞ্জনা প্রকাশনী, ১৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২
- বিশী, প্রমথনাথ। (আষাঢ়, ১৩৫১)। *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন,* প্রকাশক - জগদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- বিশী, প্রমথনাথ। (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮)। *পুরানো সেই দিনের কথা,* প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩
- দাস, সুধীরঞ্জন। (আশ্বিন, ১৩৬৬)। *আমাদের শান্তিনিকেতন,* প্রকাশক - কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার। (১৩৬৯)। *শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতী,* প্রকাশক - শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- ঘোষ, শান্তিদেব। (২২শে শ্রাবণ, ১৪০৩)। *জীবনের ধ্রুবতারা,* প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- ঘোষ, শান্তিদেব। (জুলাই,১৯৫৪)। *রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা,* প্রকাশক - ফণিভূষণ দেব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- ঘোষ, শান্তিদেব। (৭ই পৌষ, ১৩৪৯)। *রবীন্দ্রসংগীত* , প্রকাশক - রণজিৎ রায়, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ১৭
- মজুমদার, শৈলজারঞ্জন। (ডিসেম্বর,১৯৮৫)। *যাত্রাপথের আনন্দগান,* প্রকাশক - সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
- মজুমদার, শৈলজারঞ্জন। (অক্টোবর, ১৯৮৯)। *রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা,* প্রকাশক - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
- দে, কিরণশশী। (আশ্বিন, ১৩৮৮)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত : রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষক দিনেন্দ্রনাথ,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩
- দে, কিরণশশী। (বৈশাখ, ১৩৮০)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা,* প্রকাশক - সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩
- রায়, আলপনা। (২০ ডিসেম্বর, ২০০১)। *রবীন্দ্রনাথের গান - সঙ্গ-অনুষঙ্গ,* প্রকাশক - প্যাপিরাস, অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪
- রায়, আলপনা। (মে, ২০০১)। *ঐ আসন তলে,* প্রকাশক - সন্দীপ বসু সর্বাধিকারী, সপ্তক, 'অনামী', রতনপল্লি, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫

- সেনগুপ্ত, পীতম। (জানুয়ারী,২০১৮)। *রবীন্দ্র - গানের স্বরলিপিকার,* প্রকাশক - দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯
- চৌধুরী, সুভাষ। (মাঘ,১৪১০)। *গীতবিতানের জগৎ ,* প্রকাশক - অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪
- বিশ্বাস, দেবব্রত। (ভাদ্র,১৩৮৫)। *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত,* প্রকাশক - বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা - ৯
- বোস, নিমাইসাধন। (অগাস্ট, ১৯৮৮)। *Viswabharati Annals On Music,* প্রকাশক - সুব্রত চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী রিসার্চ পাবলিকেশন্স, শান্তিনিকেতন - ৭৩১২৩৫

পত্রিকাপঞ্জী

- বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক সংখ্যা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
- ‘দেশ’ পত্রিকা,সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮০ সংখ্যা, সম্পাদক - শ্রী অশোককুমার সরকার
- রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮০ সংখ্যা